আবদুস সালাম-এক ব্যতিক্রমী বিশ্বব্যক্তিত্ব

বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বে মহাবিস্ফোরণকে দেশকালের অবিচ্ছিন্ন পটভূমির এক ব্যতিক্রমী বিন্দু বলা হয়ে থাকে। আবদুস সালামকেও বোধ হয় বিজ্ঞানের আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে স্বল্প কয়েকজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর আবির্ভাব ঐ মহাবিস্ফোরণের মতোই যা সাধারণ নিয়ম-কানুন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না— যেমন ব্যাখ্যা করা যায় না গ্যালিলিও, নিউটন, ম্যাক্সওয়েল এবং আইনস্টাইনের আবির্ভাবকে।

গ্যালিলিও আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে পরীক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত অর্জন করতে হয়। নিউটন শিখিয়েছেন কিভাবে উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে প্রকৃতির আইন চিহ্নিত করতে হয়। ম্যাক্সওয়েল দেখালেন কিভাবে বিভিন্ন আইনকে একত্রিত করা যায়। আইনস্টাইন এসবের সঙ্গে যোগ করলেন মুক্তমেধার ধারণা নির্মাণের অসম সাহসিকতা। সবশেষে সালাম নিয়ে এলেন একীভূত তত্ত্ব সৃষ্টি করার রূপকথার চাবি-কাঠিটি— যা এতদিন সব পদার্থবিজ্ঞানী খুঁজে বেড়িয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই পাঁচটি নাম তাই সব সময়ই একসঙ্গেই উচ্চারিত হবে বলে মনে হয়।

আবদুস সালাম ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি পাঞ্জাবের ঝাং শহরে যে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেখানে আর্থিক প্রাচুর্য না থাকলেও বিদ্যার্জনের প্রতি ছিল এক ধর্মীয় প্রেরণা। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন 'সর্বকালের সবচেয়ে বেশি নম্বর' পেয়ে। তারপর লাহোর সরকারি কলেজের সব পরীক্ষাতেও একইভাবে তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রাখেন। তবু কেমব্রিজে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাওয়া তাঁর কাছে ছিল একটা 'দৈব ঘটনা'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পাঞ্জাবের একজন রাজনৈতিক নেতা ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার জন্য একটি তহবিল সংগ্রহ করেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে ঐ অর্থ দেয়ার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। ফলে ঐ তহবিল দিয়ে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঁচটি বৃত্তি ঘোষণা করা হল, যার একটি পেলেন আবদুস সালাম। তিনি বলেছেন, 'যেদিন আমি বৃত্তি পেলাম, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, সেদিনই আর একটি টেলিগ্রাম পেলাম যে, সেন্ট জনস কলেজে একটা অপ্রত্যাশিত খালি জায়গার সৃষ্টি হয়েছে'— যা না হলে তাঁর কেমব্রিজে যাওয়া সম্ভব হত না।

কেমব্রিজে সালাম গণিত ট্রাইপসের দ্বিতীয় অংশ এবং পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় অংশ নিয়েছিলেন এবং পরীক্ষায় দুই বিষয়েই প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। গণিতে প্রথম শ্রেণী পাওয়ার জন্য তিনি কেমব্রিজের একজন র‍্যাংগলার। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণী পাওয়া সত্ত্বেও কেমব্রিজের রীতি অনুযায়ী তিনি পরীক্ষণ-পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করলেন না, কেননা 'পরীক্ষণের কাজে যেসব গুণ প্রয়োজন তা আমার মোটেও ছিল না— ধৈর্য ধরে জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করা— আমি বুঝেছিলাম যে আমাকে দিয়ে ওসব হবে না।'

কিন্তু কোয়ান্টাম বিদ্যুৎগতি বিজ্ঞানের যে কঠিন সমস্যাটি তিনি সমাধান করলেন তার জন্যও কম ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল না। এ সময়ে প্রচলিত তত্ত্বে এমন একটা অসঙ্গতি ছিল যার ফলে ইলেক্ট্রনের ভর হয়ে যায় অসীম, বৈদ্যুতিক আধানও হয়ে যায় অসীম যা অবশ্যই অসম্ভব। জুলিয়ান সুইংগার, রিচার্ড পাইনম্যান, সিনেট্রো টোমোনাগা এই অসুবিধা কিভাবে দূর করা যায় তা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পরমাণুর অভ্যন্তরে রয়েছে কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস এবং তার মধ্যে যে প্রোটন-নিউট্রন কণা থাকে তাদের মধ্যে সক্রিয় কেন্দ্রীন-বলের তত্ত্ব আরো জটিল। এখানেই দরকার হয় যেমন ক্ষেত্রতত্ত্বের এবং এই ক্ষেত্রতত্ত্বেও যে অসীম রাশির উদ্ভব হয় তা দূর করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন সালাম। এই পদ্ধতিকে বলা হয় পুনঃসাধারণীকরণ পদ্ধতি এবং মেসন ক্ষেত্রতত্ত্বে পুনঃসাধারণীকরণের প্রমাণ সালামই প্রথম দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে ১৯৫৮ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হপকিনস পুরস্কারে ভূষিত করে।

বিদেশে পুরস্কার পেলেও দেশে তাঁর বিশেষ সুবিধা হল না। দেশে ফিরে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রধান তাঁকে পরিষ্কার বলে দিলেন যে, তিনি এতদিন যে গবেষণা করেছেন এখন তা ভুলে যেতে পারেন, কেননা এখানে গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু সালামের পক্ষে গবেষণা না করা অসম্ভব। তাই আবার তিনি কেমব্রিজে ফেলো হিসেবে ফিরে গেলেন। কেমব্রিজে এবং পরে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে সালাম দ্রুত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের পুরোগামী গবেষণায় তাঁর অনন্যসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হলেন। এ সময়েই কণা পদার্থবিজ্ঞানে প্যারিটি-ভঙ্গন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং তা ব্যাখ্যার জন্য সালাম দুই-অংশবিশিষ্ট নিউট্রিনো তত্ত্বের প্রস্তাব করেন যা প্রথমে ওলফগাংগ পাউলির মতো বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞনী মেনে নিতে চাননি। কিন্তু আজ তা-ই স্বীকৃত ব্যাখ্যা।

ষাটের দশকে সালাম কণাবিজ্ঞানে প্রতিসাম্য তত্ত্বের ওপর কাজ শুরু করেন যখন জাপানের কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ এ সম্বন্ধে বিশেষ তৎপর ছিলেন না। এই সময়ে সালাম পরিমাপ তত্ত্বের গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠেন। ১৯৬১ সালে একটি প্রবন্ধে সালাম এবং ওয়ার্ড লিখেছিলেন, 'ক্ষীণ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ার অংশগুলো তাদের সঠিক প্রতিসাম্যের গুণসহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে— স্থানীয় পরিমাপ রূপান্তরের মাধ্যমে।' স্থানীয় পরিমাপ তত্ত্ব ব্যবহার করে সালাম, গ্লাসহাও এবং ভাইনবার্গ যে একীভূত ক্ষীণ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ার তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তার জন্যই তাঁদের ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও সালাম অসংখ্য পুরস্কার ও পদক পেয়েছেন এবং পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এসসি. ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

বাংলাইন্টারনেট.কম

সালামের বৈজ্ঞানিক অবদানের মধ্যে রয়েছে দুই অংশবিশিষ্ট নিউট্রিনো তত্ত্ব এবং ক্ষীণ বিক্রিয়ায় প্যারিটি-ভঙ্গন, ক্ষীণ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক পরিমাপ একত্রীকরণ, ক্ষীণ আধানহীন প্রবাহ এবং 'ডব্লিউ ও জেড' বস্তুকণার ভবিষ্যদ্বাণী, মৌলিক কণার প্রতিসাম্য যথা ইউনিটারি প্রতিসাম্য তত্ত্ব, পুনঃসাধারণীকরণ অথবা অসীম রাশি দূরীকরণ তত্ত্ব, অভিকর্ষ এবং প্রবল বিক্রিয়ায় দুই টেন্সর তত্ত্ব; ক্ষীণ বিদ্যুতের সঙ্গে প্রবল শক্তির একত্রীকরণ, পরম বা বিদ্যুৎ-কেন্দ্রীন একত্রীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রোটন-ভঙ্গন; পরম প্রতিসাম্য, বিশেষকরে পরম মহাকাশ এবং পরম ক্ষেত্রতত্ত্ব।

এইসব গবেষণায় সালামের সংক্রামক উৎসাহ কতখানি তা তাঁকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জানেন তাঁর কোন দিন ভুলতে পারবেন না। ক্ষীণ-কেন্দ্রীন শক্তির ফলে একটি নিউট্রন ভেঙ্গে যায় একটি প্রোটন, একটি ইলেক্ট্রন ও একটি প্রতি-নিউট্রিনো কণায়। অন্য দিকে আমাদের অতি পরিচিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি সব আধানযুক্ত কণার মধ্যে সক্রিয়। এই দুটি শক্তিকে একত্রিত করা সহজ কাজ ছিল না এবং তাঁর ও গ্লাসহাও-ভাইনবার্গের সাফল্যে ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েলও খুশি হতেন, কেননা তাঁদের এই কাজ একশ' বছর আগে বিদ্যুতের সঙ্গে চৌম্বকত্বের একত্রীকরণের মতোই অসাধারণ। প্রকৃতির সব শক্তিগুলো একত্রীকরণের আইনস্টাইনের চিরন্তর স্বপ্ন আজ আর শুধু স্বপ্নই নয়, পদার্থজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, সালাম-গ্লাসহাও-ভাইনবার্গের প্রবর্তিত পরিমাপ পদ্ধতিতেই এই পরম একত্রীকরণ একদিন সম্ভব হবে এবং সেই সুদিন আর হয়তো বেশি দূরে নয়।

কিন্তু সালামের অন্য আর একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়া সম্বন্ধে একই আশাবাদ ব্যক্ত করা আজও সম্ভব নয়। ১৯৬১ সালের ১১ জানুয়ারি ঢাকায় বিজ্ঞান সম্মেলনে আবদুস সালাম প্রথম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ক্রুসেড শুরু করেন এবং বিগত তিরিশ বছর নিরলসভাবে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর আদর্শ প্রচার করে গিয়েছেন। ঐদিন তিনি ঢাকায় বলেছিলেন, 'সমাজের কোন অংশের জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণ সমাজের জন্যই ক্ষুধা, বিরামহীন পরিশ্রম এবং আশু মৃত্যু যে দূরীভূত করা যায় এর ধারণা সম্পূর্ণ নতুন।'

নতুন ধারণা হল এই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসংখ্য অবদান ব্যবহার করে যে কোন জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করা আজ সম্ভব, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সালামের ভাষায়, 'একটি আবেগময় সর্বগ্রাসী ইচ্ছা এবং সমাজের সর্বত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়ার পথে সব অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা দূর করা ও চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য তার প্রয়োগ করা।' সালাম দুঃখ করে মাঝে মাঝেই বলতেন যে, অবস্থা দেখে মনে হয় না এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

আবদুস সালাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারণা পোষণ করেছেন। এই সেদিনও ঢাকায় এসে তিনি জোরালো ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং ফলে বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জি.এন.পি.'র শতকারা ১.১ ভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি এই প্রতিশ্রুতির কিছুটা বাস্তবায়িত হয় তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেতে বাধ্য এবং সেজন্য আবদুস সালামের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীরা অবশ্য আবদুস সালামের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁর ট্রিয়েস্ট কেন্দ্রের জন্য। ১৯৪৬ সালে তিনি এই 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরেটিকাল ফিজিক্স' স্থাপন করেন— যার পেছেনে সক্রিয় ছিল তাঁর ইতালীয় বন্ধু পাউলো বুডিনির কর্মপ্রেরণা এবং ইতালীয় সরকারের অপরিসীম মহানুভবতা। উন্নয়নশীল দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা ট্রিয়েস্ট আসেন সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে যা এর পূর্বে মোটেই সম্ভব হত না।

সালাম সম্ভবত তাঁর নিজের জীবন থেকেই এ ধরনের একটি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

সালাম বুঝেছিলেন যে, যদিও ছাত্র হিসেবে ঝাং-এর স্কুলে, লাহোর সরকারি কলেজে অথবা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তবু একথাও ঠিক যে, যথাসময়ে সুযোগ না পেলে পৃথিবীর এক কোণায় তাঁর প্রতিভাও সমাজের অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যেতে পারত। ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র তিনি। পারিবারিক পরিবেশের ব্যাপারে তাঁর ভাগ্য ভালই ছিল, কেননা আধ্যাত্মিকতা এবং শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ তাঁর পরিবারের ঐতিহ্য। বিশাল সিন্ধু নদের একটি শাখা নদীর তীরে এক কৃষক সমাজের একজন নিম্নকর্মচারীর পুত্র আবদুস সালাম। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার পর তাঁর পিতা তাঁকে কি পড়া হয়েছে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। এছাড়া তাঁকে উৎসাহ যোগাতেন তাঁর মামা, যিনি পশ্চিম আফ্রিকায় এক সময়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারক ছিলেন।

সালামের চরিত্রের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ইসলামের প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ। ছোটবেলা থেকেই তিনি ইংরেজি সাহিত্যের পাশাপাশি কোরান পড়েছিলেন

এবং পরিণত বয়সেও তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ছাত্র হিসেবে ইংরেজি সাহিত্য পড়লেও তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল গণিত। কিন্তু যে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে তাঁর মতো মেধাবী তরুণের পক্ষে সরকারি চাকরিতে যোগ দেয়াই ছিল স্বাভাবিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য সরকারি চাকরিতে নতুন নিয়োগ বন্ধ ছিল বলেই তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কেমব্রিজ আসতে পেরেছিলেন।

কেমব্রিজ সালামকে মুগ্ধ করেছিল, বিশেষকরে সেন্ট জনস কলেজের ফুলের বাগানগুলোর সৌন্দর্য। পরবর্তীকালে তিনি ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও ট্রিনিটিকেই ব্রিটেনের সবচেয়ে ভাল কলেজ বলা হয়। কারণ তিনি মনে করতেন যে, ট্রিনিটির বাগানগুলো সেন্ট জনস-এর মতো মনোমুগ্ধকর নয়।

বিশেষ কোন কষ্ট না করেই সালাম র‍্যাংগলার হয়েছিলেন এবং তারপর ফ্রেড হয়েলের পরামর্শে সালাম প্রাগ্রসর পদার্থবিজ্ঞানের একটি কোর্স নিয়েছিলেন। কিন্তু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ক্যাভেনডিশ পরীক্ষাগারে সালামের অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন পরীক্ষাগারে কাজ করার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না বহুকাল পরে তাঁর নোবেল পুরস্কার বক্তৃতায় তিনি পরীক্ষণ-পদার্থবিজ্ঞানীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'একজন অকৃতকার্য পরীক্ষণ-বিজ্ঞানী হিসেবে সব সময়ই আমি বিরাট পরীক্ষণ দলের পরিবেশমণ্ডলকে ঈর্ষার চোখে দেখেছি।' এবং পরীক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি তিনি আইনস্টাইনের কথা দিয়েই প্রকাশ করেছিলেন, 'পরীক্ষণজগতের কোন জ্ঞান শুধু যৌক্তিক চিন্তার মধ্য দিয়ে আসতে পারে না, বাস্তবের সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে আসে এবং সেখানেই শেষ হয়।'

কেমিব্রজে সালামের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ ছিল তাত্ত্বিক-পদার্থবিজ্ঞানের একটা অসঙ্গতি দূর করা। এ পর্যন্ত তত্ত্বে এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে ইলেক্ট্রনের গণনাকৃত অসীম ভর এবং অসীম বৈদ্যুতিক আধানকে সসীম করা যায়। পদার্থবিজ্ঞানী জুলিয়ান সুইংগার, রিচার্ড ফাইনম্যান এবং সিনিট্রো টোমোনাগা বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বকে কিভাবে পারিমার্জিত করা যায় তা দেখিয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীন বলের মেসন তত্ত্বের ব্যাপারে এই একই কাজ করেছিলেন আবদুস সালাম। সুতরাং কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁর সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই এবং তাঁর এই ভালবাসা থেকে তিনি কখনও সরে দাঁড়াননি।

পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রত্যেকটির পেছনে রয়েছে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতি তাঁর এই ভালবাসা। এর প্রথমটি হল প্যারিটি-ভঙ্গন সংক্রান্ত। পদার্থবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, ঘটনা এবং তার দর্পন-প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই প্রতিসাম্যকেই বলে প্যারিটি-প্রতিসাম্য। একটি তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে যখন একটি ইলেক্ট্রন নির্গত হয় তখন একটি নিউট্রনো কণাও নির্গত হয়। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, গতির সাপেক্ষে নিউট্রিনোর বাঁ দিকে এবং ডানদিকে ঘূর্ণনের সম্ভাবনা একই। ১৯৫৬ সাল টি.ডি.লি এবং সি.এন. ইয়ং প্রস্তাব করেন যে, বাম ও ডানের এই সমার্থকতা সত্য নয়। এটাই প্যারিটি সংরক্ষণহীনতার আইন যা পরে পরীক্ষণের মারফত সুপ্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু সংরক্ষণহীনতার সত্যিকারের ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন সালাম। নিউট্রিনো বস্তুকণা ভরহীন বলেই তা শুধু একদিকে ঘোরে অর্থাৎ প্যারিটি লংঘিত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী পাউলি সালামের এই ধারণা প্রথমে গ্রহণ করত প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু পরে তিনিও তার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

সালামের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অবদান হল, মৌলিক কণাগুলোর শ্রেণীকরণের জন্য গণিতের দলতত্ত্ব ব্যবহার করা। সমস্যা হল এই যে, প্রকৃতিতে যেসব কণা পাওয়া যায় তার সবগুলোই কি মৌলিক? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ১৯৬০ সালে জাপানের কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী প্রথম ঐকতান প্রতিসাম্যের ধারণা প্রবর্তন করেন। তাঁদের প্রস্তাব ছিল যে, পরিচিত মৌলিক কণাগুলো আসলে আরো তিনটি মৌলিকতর কণা দিয়ে তৈরি, পরে যাদের কোয়ার্ক নাম দেয়া হয়েছে। বোধ হয় প্রাচ্যমনের সহমর্মিতার জন্য সালামই প্রথম আজাপানি পদার্থবিজ্ঞানী যিনি এই ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুকণার কোয়ার্কতত্ত্ব এই সেদিন তিন জন পরীক্ষণ পদার্থবিজ্ঞানীর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে এখন স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আবদুস সালামের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে অবশ্যই বিদ্যুৎ-চৌম্বক এবং ক্ষীণ-কেন্দ্রীন-বলের একত্রীকরণ তত্ত্বের উল্লেখ করতে হয়। এই তত্ত্বের যে অবিচ্ছেদ্য অংশ 'গেজ ইনভ্যারিয়ান্স' বা মাপ অপিরবর্তনের নীতি তার ব্যাপারেও উৎসাহী প্রথম দিকে ছিলেন সালামই। আগেই বলেছি ১৯৬০ সালের দিকে তিনি এবং ওয়ার্ড একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'আমাদের মৌল স্বীকার্য এই যে, প্রবল, ক্ষীণ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ার অংশগুলো তদের সঠিক প্রতিসাম্যের গুণসহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে (তাদের আপেক্ষিক শক্তির মধ্যে সম্পর্কের সূত্রসহ) এবং সব বস্তুকণার মুক্ত লাগ্রাঞ্জিয়ান অপেক্ষকের গতিশক্তির অংশে পানির পরিমাপ রূপান্তরের মাধ্যমেই সেটা করা সম্ভব হবে।' এই স্থানীয় পরিমাপ রূপান্তরের কথা সালাম এবং ওয়ার্ডই প্রথম পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন এবং এটাই আজকাল মৌলিক কণার তত্ত্বে মূল ধারণা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কণা-পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশে আবদুস সালাম তাঁর প্রতিভার কালজয়ী স্বাক্ষর রেখেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছরের নিরলস গবেষণার মাধ্যমে। এই সেই ঝাং-এর পাঞ্জাবি কিশোরের কাহিনী— যে একজন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আরো একজন আবদুস সালাম আছেন যিনি সবচেয়ে আধুনিক ইহজাগতিক মানুষ, আন্তর্জাগতিক কূটরাজনীতিতে যিনি সমান দক্ষ এবং তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান সংগঠনের জন্য একজন অক্লান্তকর্মী মানুষ— যাঁর স্বদেশ হল সারা পৃথিবী।

১৯৫১ সালে যখন সালাম কেমব্রিজের পুষ্পশোভিত পরিচিত জগত ছেড়ে লাহোরের রুক্ষ অপরিচিত জগতে ফিরে আসেন, তখন চার বছর তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান ছিলেন। এই সময়ে তাঁকে নাকি ফুটবল ক্লাবেরও প্রধান করে দেয়া হয়। তবে এটা কতখানি সত্য বলা মুসকিল, কেননা খেলাধুলায় তাঁর বিশেষ কোন যোগ্যতা

ছিল এমন দাবি তিনি কখনও করেননি। তবে একথা সত্য যে, লাহোরের কর্মজীবনের পরিবেশে চরম হতাশাবোধ তাঁকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে বাধ্য করে এবং তাঁর কথামতো তিনি অনিচ্ছার সঙ্গে 'মগজ পাচারের' শিকার হলেন। তিনি বলেছেন, 'অন্যান্য পদার্থবিজ্ঞানী কি চিন্তা করছেন তা আপনাকে জানতে হবে এবং তাঁদের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে। আমার ভয় হয়েছিল যে, আমি যদি লাহোরে থাকি তবে আমার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর তারপর আমার দেশের কোন কাজে আমি লাগব?' অবশ্য সারাজীবন লন্ডন-ট্রিয়েস্টে বসবাস করে সালাম তাঁর দেশের জন্য, তাঁর দেশের বিজ্ঞানের জন্য সেরকম দীর্ঘস্থায়ী কিছু করতে পেরেছেন এমন কথা হয়তো বলা যায় না। তবু পদার্থবিজ্ঞানের জন্য এই বিশেষ 'মগজ পাচার' যে জরুরি ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

আবদুস সালাম তাঁর নিজের দেশের বিজ্ঞানের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু না করতে পারলেও তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীদের তিনি কখনও ভোলেননি। ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আহূত শান্তির জন্য পরমাণু সম্মেলনের তিনি বৈজ্ঞানিক সচিব ছিলেন। ভারতের হোমি ভাবা ছিলেন সভাপতি। ঐ বিখ্যাত সম্মেলন অনেকের মতো সালামকেও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চিন্তা এখান থেকেই তাঁর মনে আসে এবং তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে পরে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থায় তিনি এই ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তাঁকে এ ব্যাপারে নানা দেশে অক্লান্ত লবি করতে দেখেছি এবং ট্রিয়েস্টের ওবারডানে যখন এই কেন্দ্রটি প্রথম স্থাপন করা হয় সেসব দিনের স্মৃতি আজো আমাদের অনেকের মনে উজ্জ্বল। প্রথম দিকে আমেরিকা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এমনকি ভারতও এই কেন্দ্রের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না এবং কোন কোন দেশ সক্রিয়ভাবে এর বিরোধিতা করেছে যদিও পরবর্তীকালে এইসব দেশই এই কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে সবচেয়ে বেশি। সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রের খরচের বেশির ভাগই যুগিয়েছে ইতালি সরকার, তারাই কেন্দ্রের জন্যে এড্রিয়াটিক সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের ওপরে এমন একটি অপূর্ব আন্তর্জাতিক কেন্দ্র তৈরি করে দিয়েছেন যার তুলনা মানুষের ইতিহাসে আর নেই। বিজ্ঞানের মানচিত্রে এই আন্তর্জাতিক কেন্দ্রকে চিরস্থায়ী করার কৃতিত্ব অবশ্য আবদুস সালামের এবং তাঁর সহকর্মীদের, যাঁদের মধ্যে বুডিনিচ, ফ্রন্সডাল, বারুট, স্ট্যাথডি এবং ডেলবুর্গের নাম অবশ্যই করতে হয়। তাঁরাই বিশ্বের প্রথম সার্থক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী।

ট্রিয়েস্ট কেন্দ্রে সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য বিজ্ঞানী আসেন। এখনো তাঁর আসেন নতুন জ্ঞান লাভের জন্যে এবং তাঁদের নিজেদের বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলতে যা গবেষণার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এভাবেই ট্রিয়েস্ট কেন্দ্র 'মগজ পাচার' বন্ধ করবে আশা করেছিলেন আবদুস সালাম। সেটা অবশ্য হয়নি কিন্তু সেজন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। তৃতীয় বিশ্বের অতলস্পর্শী দারিদ্র্যের কবল থেকে মেধাবী তরুণ-তরুণী মুক্তি পেতে চাইবে, এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এবং এই দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে মেধাবী বিজ্ঞানীকে রক্ষা করা একটিমাত্র কেন্দ্রের পক্ষে যে সম্ভব নয়, এটা আবদুস সালামও বোঝেন। তাই তিনি শেষজীবনে সারা পৃথিবীতে এই ধরনের অন্তত বিশটি কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন— যার মধ্যে বাংলাদেশের নামও আছে।

আসলে অনুন্নত দেশগুলির বিধ্বস্ত অবস্থা সম্বন্ধে আবদুস সালাম যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে মর্মস্পর্শী ভাষায় সোচ্চার তেমন বোধ হয় আর কেউই নয়। স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক শোষণের কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার পর আবদুস সালাম ওমর খৈয়ামের এই কয়েকটি পঙক্তি আবেগের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন,

আঃ ভালবাসা! তুমি আর আমি ভাগ্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে
দুঃখজনক সব ব্যাপারের নকশা যদি একত্র করতে পারতাম,
তাহলে কি আমরা এসব কিছু ভেঙে টুকরো টুকরো করতাম না?
আর তারপরে আমাদের অন্তরের অন্তরতম ইচ্ছা অনুসারে
আবার তা নতুন করে গড়ে তুলতাম না?

তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করত এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করেই যে দারিদ্র্যের অভিশাপ মোচন করা যায়, একথা তিনি তিরিশ বছর ধরে দেশে দেশে চারণকবির মতো বলে বেড়িয়েছেন। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমার কাছে সবসময় অত্যন্ত আশ্চর্য লেগেছে যে, ধনী দেশের কত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি পৃথিবীর দারিদ্র্যের তীব্রতা সম্বন্ধে বাস্তবিকই সচেতন।'

তিনি বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে কখনোই দেখতে চাননি— সারাদেশের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই তিনি সারাজীবন বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের সকলের বোঝা উচিত যে, এই বিজ্ঞান মোটেই চটকদারি প্রকৃতির নয়, এখানে প্রধানত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের কথাই বলা হয়। অতি পরিচিত প্রযুক্তির কিছু কিছু দক্ষতা অর্জনের এটা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। আমাদের মানবিক এবং বস্তুগত যে সম্পদ রয়েছে তারই সবচেয়ে ভাল প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবহারের চিন্তাশীল হিসাব-নিকাশই হল এই বিজ্ঞান।'

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে দক্ষতা অর্জনের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যদি তৃতীয় বিশ্ব একদিন সত্যিকারের সাফল্য অর্জন করে তবে আবদুস সালামের নাম অবশ্যই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তখন উচ্চারিত হবে। এখন যেমন তাঁর নাম কণা-পদার্থবিজ্ঞানে প্রায় প্রতিটি বাক্যে উচ্চারিত হয়।

এথেন্স নগরীর পাশে প্লেটো যে একাডেমি স্থাপন করেছিলেন আড়াই হাজার বছর পরে ঝাং-এর এক তরুণ সেই একই স্বপ্ন, সেই একই দুরাশা আরো ব্যাপক আকারে, আরো আন্তর্জাতিক রূপে বাস্তবায়িত করেছেন। ট্রিয়েস্ট কেন্দ্রের দোতলার শেষের ঘরটিতে ধ্যানমগ্ন এই বিজ্ঞানী এথেন্সের সেই দার্শনিককেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যাঁর কাছ থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষ জ্ঞানের প্রথম পাঠ নিয়েছে।